SKBU JOURNAL OF PHILOSOPHY
PEER REVIEWED

ন্যায় ও বৌদ্ধ দর্শনে অর্থ: একটি সমীক্ষা

অতনু সাহা

ভারতবর্ষে দর্শন চর্চার ইতিহাস সুপ্রাচীন ও সমৃদ্ধ। যুগে যুগে প্রাজ্ঞ, বিচক্ষণ ঋষি-দার্শনিকগণের লোকাতীত মননশীলতা এই দর্শন আলোচনাকে সমৃদ্ধ করেছে। বিচার, বিশ্লেষণ, পূর্বপক্ষ খণ্ডন, স্বমত প্রতিষ্ঠা, সূক্ষ্ম পর্যবেক্ষণ ইত্যাদির মধ্য দিয়ে দার্শনিক আলোচনা প্রবাহিত হয়েছে। কালিক ব্যাবধানে তাই গড়ে উঠেছে বিভিন্ন দর্শন সম্প্রদায় ও বিবিধ মত। দর্শনের আলোচনা কখনও থমকে যায়নি। একটি দর্শন সম্প্রদায়ের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত মত অন্য একটি দর্শন সম্প্রদায়ের প্রশ্নের সম্মুখীন হয়েছে। কখনও বা একই দর্শন সম্প্রদায়ের পরবর্তী দার্শনিকগণ প্রশ্ন তুলেছেন। ফলত উদ্ভব হয়েছে নতুন মতের, কখনও বা একটি মত নিজ সম্প্রদায়ের পরবর্তী কালের দার্শনিকগণের হাত ধরে অন্য দিকে বাঁক নিয়েছে। সুতরাং বলা যেতে পারে প্রশ্ন উত্থাপন দর্শন আলোচনা এগিয়ে নিয়ে যাওার চালিকা শক্তি স্বরূপ। ভারতীয় দর্শনের ঐতিহ্য ও পরম্পরা অনুসারে অধ্যাত্মবাদী আস্তিক কিংবা নাস্তিক দর্শনের চর্চা যেমন বিস্তার লাভ করেছে, তেমনই ভাষাদর্শনের চর্চাও বিস্তার লাভ করেছে পাশাপাশি, সমান্তরালভাবে। এই গবেষণামূলক নিবন্ধটি ভারতীয় ভাষাদর্শনে বহুল চর্চিত বিষয় 'অর্থ' কেন্দ্রিক। ভারতীয় ভাষাদর্শনে 'অর্থ' বিষয়ক আলোচনার বিস্তার ব্যাপক ও বহুমাত্রিক। এই বিস্তৃত ও বহুমাত্রিক আলোচনায় একাধিক ভারতীয় দর্শন সম্প্রদায় তথা দার্শনিকগণের মত এবং একের সঙ্গে অন্যের বিমত লক্ষ্য করা যায়। ফলত বহু বিতর্কের রসদ এই আলোচনা থেকে পাওয়া সম্ভব। বর্তমান এই নিবন্ধের সংক্ষিপ্ত পরিসরে ন্যায় দর্শন ও বৌদ্ধ দর্শন সম্প্রদায় সম্মত 'অর্থ' বিষয়ক আলোচনা উপস্থাপিত হবে। বস্তুবাদী নৈয়ায়িকগণ অর্থের বাখ্যা দিতে গিয়ে শব্দ বা পদের বাস্তব সত্তা স্বীকারের পাশাপাশি পদার্থের বাস্তব সত্তাকেও গ্রহণ করেছেন। তাঁদের মতে পদার্থ মননিরপেক্ষ ও ব্যক্তি নিরপেক্ষভাবে বাহ্য জগতে অস্তিত্ববান। তাই ন্যায় মতে অর্থ হল বস্ত্বর্থ। আবার বৌদ্ধ মতে অর্থ বুদ্ধিনিষ্ঠ। তাঁদের মতে অর্থ হল 'কল্পনা' মাত্র, এর কোন বাহ্য অস্তিত্ব নেই। তাই তাঁদের মতে অর্থ হল বৌদ্ধার্থ।

ভারতীয় ভাষাদর্শনের সামগ্রিক আলোচনার মূল স্তম্ভ হল তিনটি— শব্দ, অর্থ ও শব্দার্থ সম্বন্ধ। ভাষাদর্শনের সামগ্রিক আলোচনার অন্যতম মূল স্তম্ভ 'অর্থ' এই নিবন্ধের আলোচ্য বিষয়। এই অর্থ বিষয়ক আলোচনায় রত হয়ে দেখলাম অর্থ কেন্দ্রিক আলোচনার ক্ষেত্রে ভারতীয় দার্শনিকদের মধ্যে যথেষ্ট বৈমত্য রয়েছে। আলোচনার গভীরতা বৃদ্ধির সাথে সাথে অর্থ বিষয়ে ভারতীয় ভাষাদার্শনিকগণের দৃষ্টিভঙ্গী সুস্পষ্ট হয়েছে। খুব স্পষ্ট করে বলতে গেলে বলতেই হয় অর্থ কেন্দ্রিক

আলোচনায় একটি বিতর্কের বিলক্ষণ উপস্থিতি লক্ষ্য করা যায়। এই গবেষণামূলক নিবন্ধের সংক্ষিপ্ত পরিসরে এই বিতর্ককে সুস্পষ্টভাবে তুলে ধরার চেষ্টা করা হবে।

এই অর্থ বিষয়ক আলোচনা মূলত দুটি দর্শনসম্প্রদায়ের মত অবলম্বন করে অগ্রসর হবে। তা হল ন্যায় ও বৌদ্ধ সম্প্রদায়। অর্থ বিষয়ক আলোচনার গভীরে প্রবেশ করার পূর্বে অর্থটি যার তার আলোচনা অর্থাৎ শব্দের আলোচনা খুবই প্রাসঙ্গিক, যা এই অর্থ বিষয়ক আলোচনার পথকে সুগম করে। তাই ন্যায় ও বৌদ্ধ দর্শন সম্মত শব্দ বিষয়ক অভিমত সংক্ষিপ্তাকারে উপস্থাপিত হবে।

ন্যায় দর্শনের আঙ্গিকে শব্দ:

শব্দালোচনার বহুমুখীতা ও বহুরূপতার দিকটি ধরা পরে যখন আধিবিদ্যক, জ্ঞানতাত্ত্বিক ও ভাষাতাত্ত্বিক দিক অবলম্বন করে শব্দ বিষয়ক আলোচনার ধারা বিস্তার লাভ করে। শব্দ দ্রব্য না গুণ? শব্দ নিত্য না অনিত্য? আধিবিদ্যক দৃষ্টিকোণ থেকে এই প্রশ্নগুলি খুবই স্বাভাবিক। ভারতীয় দর্শনে প্রমাণতত্ত্বের একটি গুরুত্বপূর্ণ অবস্থান লক্ষ্য করা যায়। তাহলে প্রমাণ হিসাবে শব্দ কি সকল দর্শনে স্বীকৃত? যাঁরা স্বীকার করেন তাঁরা সকলেই কি একইভাবে স্বীকার করেন? কোন্ শব্দ প্রমাণ? (বৈদিক না লৌকিক, পৌরুষেয় না অপৌরুষেয়?) আবার বাক্যের অংশ রূপে শব্দ(পদ)-এর গুরুত্বও অপরিসীম। এই শব্দ কি ধন্যাত্মক নাকি বর্নাত্মক? শব্দ কোনটি? এই সমস্ত প্রশ্নগুলি অর্থ কেন্দ্রিক আলোচনায় খুবই স্বাভাবিক এবং প্রাসঙ্গিক।

ন্যায় দর্শনে শব্দ গুণ রূপে স্বীকৃত। ন্যায় দর্শনে আকাশ দ্রব্য রূপে স্বীকৃত, আর এই আকাশ নামক দ্রব্যের গুণ হল শব্দ। অর্থাৎ শব্দ আকশের গুণ রূপে স্বীকৃত।[১] আকাশ অধিকরণে শব্দ সমবায় সম্বন্ধে বিদ্যমান। আকাশ নামক দ্রব্যের লক্ষণ দেওয়া হয়েছে 'শব্দগুণক' বলে। ন্যায় মতে শ্রবণেন্দ্রিয় দ্বারা যে গুণের প্রত্যক্ষ হয় তাই হল শব্দ এবং তা আকশ দ্রব্যে সমবেত।[২]

শব্দ নিত্য না অনিত্য? শব্দের স্বরূপ বিষয়ক আলোচনায় এরূপ প্রশ্ন অবশ্যম্ভাবী। ন্যায় দার্শনিকগণ শব্দের অনিত্যতা পক্ষ সমর্থন করেছেন। তাঁদের মতে অন্যান্য জাগতিক বস্তুর মতো শব্দেরও উৎপত্তি হয়, আবার বিনাশও ঘটে, তাই শব্দ অনিত্য। শব্দের অনিত্যত্ব পরীক্ষা হেতু মহর্ষি সূত্রের অবতারণা করেছেন। তিনি ন্যায়সূত্রে বলেছেন, "আদিমত্ত্বাদৈন্দ্রিয়কত্বাৎ কৃতকবদুপচারচ্চ"।[৩] অর্থাৎ উৎপত্তিমত্ত্ব হেতুক, ইন্দ্রিয়গ্রাহ্যত্ব হেতুক এবং কার্য বা অনিত্য সুখ-দুঃখাদির ন্যায় (তীব্র শব্দ, মন্দ শব্দ ইত্যাদি) ব্যাবহার হেতু শব্দ অনিত্য। ভাষ্যকার বাৎস্যায়ন তাঁর ন্যায়ভাষ্যে উক্ত সূত্রের

ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে বলেছেন, "সংযোগবিভাগজশ্চ শব্দঃ....."।[৪] অর্থাৎ যেহেতু শব্দ সংযোগ বিভাগ রূপ কারণ জন্য তাই শব্দ কারণবিশিষ্ট, আর কারণবিশিষ্ট পদার্থ বলেই ঘট, পটাদির ন্যায় শব্দও অনিত্য।

ন্যায় দর্শনে প্রমাণ রূপে শব্দের স্থান স্বতন্ত্র। মহর্ষি গৌতম তাঁর ন্যায়সূত্রে বলেছেন, "প্রত্যক্ষানুমানোপমানশব্দাঃ প্রমাণানি"।[৫] চারটি প্রমাণের মধ্যে প্রত্যক্ষই জ্যেষ্ঠ প্রমাণ— একথা সর্বজন স্বীকৃত। ইন্দ্রিয়গুলি অর্থের সঙ্গে সন্নিকৃষ্ট হলে প্রত্যক্ষ জ্ঞান উৎপন্ন হয়। এই জ্ঞানই অন্যান্য সকল অনুভূতির মূল। জ্ঞান লাভ হলে তারপর তার ব্যবহার সম্ভব হয়। আর এই জ্ঞানের ব্যাবহারের জন্য শব্দপ্রয়োগ অবশ্যম্ভাবী। তাই প্রমাণ হিসাবে শব্দ খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

জাগতিক শব্দ মাত্রই ন্যায় দর্শনে স্বীকৃত শব্দ প্রমাণ নয়। যে শব্দ থেকে একটি বিশিষ্ট অর্থের বোধ জন্মায় বা অর্থ বিশেষের যথার্থ অনুভব হয় সেই শব্দই ন্যায় মতে প্রমাণ রূপে স্বীকৃত। ন্যায় দর্শনে স্বীকৃত চারটি প্রমাণের সবশেষে শব্দ প্রমাণের উল্লেখ করা হলেও এর গুরুত্ব অপরিসীম। এই শব্দ প্রমাণের লক্ষণ প্রসঙ্গে মহর্ষি গৌতম তাঁর ন্যায়সূত্রে বলেছেন, "আপ্তোপদেশ শব্দঃ"।[৬] আপ্তের উপদেশই হল শব্দ। 'আপ্ত' প্রসঙ্গে বলা হয়েছে, যিনি নিজে ধর্মকে সাক্ষাৎ করেছেন এবং তিনি যেভাবে ধর্মকে অবধারণ করেছেন, উপদেশ দেওয়ার সময় কৃতযত্ন হয়ে ঠিক সেইভাবে ধর্ম বা পদার্থের খ্যাপন বা জানানোর ইচ্ছা করতে পারেন তিনিই আপ্ত ব্যক্তি।[৭] এমনই আপ্তব্যক্তির উপদেশই হল শব্দ প্রমাণ। লক্ষণ প্রকাশের পর মহর্ষি গৌতম তাঁর উক্ত গ্রন্থে পরবর্তী সূত্রে শব্দ প্রমাণের দুটি প্রকারের কথা বলেছেন। সেই প্রকার দুটি হল— দৃষ্টার্থক এবং অদৃষ্টার্থক।[৮] যে সকল বাক্যের অর্থ ইহলৌকিক সেগুলিকে দৃষ্টার্থক শব্দ বলা হয়। আর যে সকল বাক্যের অর্থ ইহলোকে প্রত্যক্ষ যোগ্য নয়, তাদের অদৃষ্টার্থক শব্দ বলা হয়। মহর্ষি গৌতম অদৃষ্টার্থক আপ্তবাক্যের পাশাপাশি দৃষ্টার্থক আপ্তবাক্যকেও শব্দ প্রমাণ রূপে স্বীকার করেছেন। অনুরূপভাবে কেবল বৈদিক বাক্যই শব্দ প্রমাণ এমন নয়, ব্রাহ্মণ তথা ম্লেচ্ছাদির লৌকিক বাক্যও শব্দ প্রমাণ হতে পারে।[৯]

ভাষাতাত্ত্বিক আঙ্গিকে শব্দের আলোচনা সেই প্রাচীন ঋকবৈদিক যুগ থেকে চলে আসছে। ন্যায় দর্শনেও শব্দের ভাষাতাত্ত্বিক আলোচনার দিকটি বিশেষভাবে লক্ষ্যণীয়। ন্যায় দর্শনে শব্দ দুই প্রকার— ধ্বনি শব্দ ও বর্ণ শব্দ। মৃদঙ্গ, ঘণ্টা প্রভৃতি থেকে যে শব্দ উৎপন্ন হয় তা হল ধ্বনি শব্দ বা ধ্বন্যাত্মক শব্দ। আর কণ্ঠ, তালু প্রভৃতির অভিঘাত সংযোগ থেকে যে শব্দ উৎপন্ন হয়, তাকে বলা হয় বর্ণ শব্দ বা বর্ণাত্মক শব্দ। অর্থাৎ যে শব্দকে বিশেষ কোন বর্ণে বা বর্ণমালার অক্ষরে বিশ্লেষিত করে বোঝা যায়, তাই বর্ণাত্মক শব্দ। কণ্ঠ, তালু প্রভৃতির অভিঘাত সংযোগ থেকে কখনও কখনও ধ্বন্যাত্মক শব্দেরও উৎপত্তি হয়ে থাকে। ন্যায় দর্শনে ধ্বন্যাত্মক শব্দের নির্দিষ্ট, ব্যক্তি নিরপেক্ষ কোন অর্থ নেই। একই শব্দ ভিন্ন ভিন্ন

ব্যক্তির কাছে ভিন্ন ভিন্ন অর্থরূপে বোধগম্য হয়। ধ্বন্যাত্মক শব্দের অর্থ ব্যক্তিগত ও আপেক্ষিক। অপর দিকে বর্ণাত্মক শব্দসমূহ ন্যায় মতে নির্দিষ্ট অর্থ যুক্ত একার্থ বোধক এবং এই অর্থ ব্যক্তি নিরপেক্ষ। এই নির্দিষ্ট অর্থযুক্ত বর্ণাত্মক শব্দ-ই ন্যায় দর্শনে 'পদ' রূপে অভিহিত।

বৌদ্ধ দর্শনের আঙ্গিকে শব্দ:

বৌদ্ধ দর্শনে শব্দ স্বতন্ত্র প্রমাণ রূপে স্বীকৃত নয়। বৌদ্ধতাত্ত্বিকগণ বলেন শব্দ কখনও সত্যকে প্রকাশ করতে পারে না। কেননা তাঁদের মতে জাগতিক কোন বিষয়ের স্বরূপকে শব্দ দ্বারা প্রকাশ করা যায় না। বৌদ্ধগণ জগতের যাবতীয় বিষয়কে দুই ভাবে জানা সম্ভব বলে মত ব্যক্ত করেছেন, স্বলক্ষণ এবং সামান্যলক্ষণ।[১০] বস্তুর যথার্থ স্বরূপ ধরা পড়ে তার 'স্বলক্ষণ' অবস্থায়। আচার্য ধর্মকীর্ত্তি স্বলক্ষণের পরিচয় দিতে গিয়ে বলেছেন, 'অর্থক্রিয়াসামর্থ্যলক্ষ্যণত্বাদ্ বস্তুনঃ'।[১১] অর্থাৎ অর্থক্রিয়াসামর্থ যে বস্তুর আছে তাই হল স্বলক্ষণ। বৌদ্ধ মতে স্বলক্ষণই পরমার্থসৎ। অর্থক্রিয়া বা প্রয়োজন সাধনের শক্তি যে বস্তুর রয়েছে তাই পরমার্থসৎ বস্তু। তাঁদের মতে প্রত্যক্ষের যথার্থ বিষয় যে বস্তু তার দ্বারা অর্থক্রিয়া সাধিত হয়, তাই প্রত্যক্ষের এই যথার্থ বিষয়টি হল স্বলক্ষণবস্তু। আর যা স্বলক্ষণ রূপে জ্ঞানের বিষয় হয় না অর্থাৎ যার নিজের অর্থক্রিয়াসামর্থ নেই, তাই হল সামান্য লক্ষণ। সামান্যের দ্বারা যে লক্ষণসৃষ্ট তাই সামান্য লক্ষণ।[১২]

পরমার্থসৎ রূপ স্বলক্ষণকে যখন শব্দের মাধ্যমে জানার বা প্রকাশ করার চেষ্টা করা হয় তখন তার স্বলক্ষণ চরিত্রটি বিঘ্নিত হয় অর্থাৎ 'ক্ষণিক' বৈশিষ্টটি থাকে না। তাই সামান্য লক্ষণ বস্তু পরমার্থসৎ নয়, তা হল সংবৃতিসত্য।[১৩] বৌদ্ধ মতে জ্ঞান লাভের সময় কোন বস্তুকে যখন শব্দের দ্বরা অভিহিত করা হয় তখন জ্ঞানের ধারায় এমন একটি অবস্থার সৃষ্টি হয় যে, জ্ঞানে অন্য আকারের মিশ্রণ যুক্ত হয়ে জ্ঞানটি অবস্থান করে। তাঁদের মতে এই জ্ঞানটি বাচকশব্দ-সংসৃষ্ট জ্ঞান এবং সামান্য লক্ষণ তার বিষয়।[১৪] আর সামান্য লক্ষণের বিষয়মাত্রই কল্পনা বা বিকল্প। বিষয় দ্রব্য, গুণ, কর্ম, নাম ও জাতি বিশিষ্ট রূপেই শব্দে বা ভাষায় প্রকাশযোগ্য হয়, তাই দ্রব্য, গুণ, কর্ম, নাম ও জাতি—এগুলিকেই কল্পনা বলা হয়েছে।[১৫] বৌদ্ধ দার্শনিকগণের মতে শব্দও স্বলক্ষণের বিষয় হয়। কিন্তু ক্ষণনিষ্ঠ শব্দস্বলক্ষণ শব্দবোধ্য হয় না। তবে এই ক্ষণনিষ্ঠ শব্দ স্বলক্ষণের শ্রবণেন্দ্রিয়ের সঙ্গে সন্নিকর্ষের ফলে শ্রাবণ প্রত্যক্ষ হয়। তাই স্বলক্ষণাকার শ্রাবণ প্রত্যক্ষের জ্ঞানের বিষয়রূপে স্বলক্ষণাকার শব্দ স্বীকৃত।

SKBU JOURNAL OF PHILOSOPHY
PEER REVIEWED

ন্যায় দর্শন সম্মত অর্থ:

ভারতীয় ভাষাদর্শনে 'অর্থ' শব্দটির ব্যবহার অতি ব্যাপক। বস্তুবাদী ন্যায় দর্শনে 'অর্থ' শব্দটির ব্যবহার বহুমুখী হলেও ন্যায় দর্শনে 'অর্থ' সবসময়ই বস্তুর্থ। ন্যায়মতে অর্থ সব সময় কোন না কোন অস্তিত্বশীল পদার্থ যা বাহ্য জগতে বিদ্যমান। ভাষাতাত্ত্বিক দিক থেকে অর্থ বাচ্যার্থ রূপেই ব্যাপকভাবে আলোচিত। তবে ন্যায় দর্শনে পদার্থ, প্রমেয়ার্থ, শক্যার্থ, ইন্দ্রিয়ার্থ, অভিধেয়ার্থ ইত্যাদি রূপেও আলোচিত হয়েছে। একটি পদের দ্বারা যে বিষয়ের জ্ঞান হয় বা একটি পদ যে বিষয়কে বোঝায় বা নির্দেশ করে, সেটিই হল ঐ পদের অর্থ বা পদার্থ। ন্যায়মতে অর্থ যখন পদার্থ, তখন পদার্থ হল গ্রাহ্য, ত্যাহ্য ও উপেক্ষণীয় পদার্থ। বাৎস্যায়ন তাঁর ভাষ্যে বলেছেন "অর্থস্তু সুখং সুখহেতুশ্চ দুঃখং দুঃখহেতুশ্চ।"[১৬]

ন্যায় দর্শনে স্বীকৃত ষোড়শ পদার্থের মধ্যে প্রমেয় হল দ্বিতীয়। চতুর্বিধ প্রমাণের দ্বারা যথাযথভাবে উপলব্ধ যে অর্থ বা জ্ঞানের বিষয় তাই হল প্রমেয়। এ প্রসঙ্গে বলা যায় যে, অর্থ ও প্রমেয়ার্থের মধ্যে সূত্রকার একটি সূক্ষ্ম ভেদ নির্দেশ করেছেন। প্রমাণের দ্বারা গ্রাহ্য বিষয়কে বলা হয় প্রমেয়ার্থ, এই প্রমেয়ার্থ দ্বাদশ প্রকারের। লক্ষ্যণীয় যে, এই দ্বাদশ প্রমেয়ের মধ্যে অন্যতমরূপে তিনি অর্থের উল্লেখ করেছেন।[১৭] তাই প্রমেয়রূপে অর্থ অন্যতম প্রমেয়ার্থ হলেও তা অন্যান্য প্রমেয়ার্থ থেকে ভিন্ন।

এই অর্থ যখন ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য হয়, তখন তা ইন্দ্রিয়ার্থ। যে সকল বিষয় ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য হওয়ার যোগ্য সেগুলিই ইন্দ্রিয়ার্থ পদবাচ্য। ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বিষয় নানা প্রকার। পঞ্চবহিরিন্দ্রিয় এবং অন্তরিন্দ্রিয় দ্বারা গ্রাহ্য সকল বিষয়ই ন্যায়মতে ইন্দ্রিয়ার্থ। আবার পদের দ্বারা অর্থ যখন অভিধেয় হয়, তখন তাকে বলা হয় অভিধেয়ার্থ। অভিধেয়ার্থকে আবার শক্যার্থও বলা হয়। শক্তিলভ্য অর্থকে বলা হয় শক্যার্থ। শক্তি হল সাধারণভাবে পদের সঙ্গে পদার্থের সম্বন্ধ, শাব্দবোধের অনুকূল পদপদার্থের সম্বন্ধ। এই শক্তি কোন স্বতন্ত্র পদার্থ নয়, ইচ্ছারূপ গুণ পদার্থ। শক্তির দ্বিবিধ রূপ। শক্তির প্রথম প্রকার রূপ হল, পদ বিশেষ্যক পদার্থ প্রকারক শক্তি, আর দ্বিতীয় প্রকার রূপ হল, পদার্থ বিশেষ্যক পদ প্রকারক শক্তি। 'এই পদ এই পদার্থকে বোঝাক' (ইদং পদং অয়ম্ অর্থং বোধয়তু) হল প্রথম প্রকার শক্তির আকার, কারণ এখানে পদ বিশেষ্য রূপে এবং পদার্থ বিশেষণ রূপে জ্ঞানের বিষয় হয়েছে। 'এই পদার্থ এই পদের দ্বারা বোদ্ধব্য' (অস্মাৎ পদাৎ অয়ম্ অর্থঃ বোদ্ধব্যঃ) হল দ্বিতীয় প্রকার শক্তির দৃষ্টান্ত। পদে পদার্থবোধক শক্তি থাকে বলেই পদ উচ্চারিত হয়ে অর্থকে উপস্থাপন করে। এই অর্থই হল শক্যার্থ। শক্তি বা সংকেত অভিধারই নামান্তর। এই অভিধেয়ার্থ আবার বাচ্য অর্থ বা বাচ্যার্থও। ন্যায় সম্মত ভাষাদর্শনে অর্থ শব্দটি বাচ্যার্থরূপেই পরিচিত। একটি পদের দ্বারা যে অর্থ বাচ্য তাই হল বাচ্যার্থ।

নৈয়ায়িকগণের মতে পদার্থ মননিরপেক্ষ ও ব্যক্তি নিরপেক্ষভাবে বাহ্য জগতে অস্তিত্ববান। তাই ন্যায় মতে অর্থ হল বস্তুর্থ। উদাহরণ হিসাবে যদি 'গো' শব্দটি গ্রহণ করা যায় তাহলে দেখা যায় যে 'গো' পদের বাচ্যার্থ্য হিসাবে বাহ্য জগতে 'গো' নামক প্রাণীটি অস্তিত্ববান। এমতাবস্থায় একটি সংশয়ের সৃষ্টি হয়, 'গো' পদের বাচ্যার্থ হিসাবে বাহ্য জগতে যেমন 'গো' নামক প্রাণীটি অস্তিত্ববান, ঠিক তেমনই গো-এর ব্যক্তি, আকৃতি ও জাতিটিও বর্তমান। তাহলে গো পদের বাচ্যার্থ কি গো-এর ব্যক্তি, আকৃতি ও জাতি এই তিনটির যে কোন একটি না কি সবকটিই? অর্থাৎ 'গো' পদটির দ্বারা বিশেষ গরুটিকে বুঝি? না গো আকৃতিটিকে বুঝি? না কি গোত্ব জাতিটিকে বুঝি? মহর্ষি গৌতম নিজেই এই সংশয় উত্থাপন পূর্বক নিরসন করেছেন ন্যায় সূত্রের দ্বিতীয় অধ্যায়ের দ্বিতীয় আহ্নিকে। উক্ত আহ্নিকের ছেষট্টি সংখ্যক সূত্রে বলেছেন, "ব্যক্ত্যাকৃতি-জাতয়স্তু পদার্থঃ।"[১৮] অর্থাৎ ব্যক্তি, আকৃতি ও জাতি এই তিনটিই পদের দ্বারা বোধিত অর্থ বা বাচ্যার্থ। অর্থাৎ 'গো' এই পদটির বাচ্যার্থ কখনো গো ব্যক্তিটি অর্থাৎ বিশেষ গরুটি, আবার কখনো গরুর আকৃতিটি আবার কখনো গোত্ব জাতিটি।

পদের বাচ্য অর্থ তথা বাচ্যার্থ যে ব্যক্তি তা সমর্থন করতে গিয়ে মহর্ষি গৌতম ন্যায়সূত্রে বলেছেন, "যাশব্দ-সমূহ-ত্যাগ-পরিগ্রহ-সংখ্যা-বৃদ্ধ্যপচয়-বর্ণ-সমাসানুবন্ধানাং ব্যক্তাবুপচারাদ্-ব্যক্তিঃ"।[১৯] সূত্রোক্ত 'যা' শব্দের দ্বারা ব্যক্তিতেই উপচার বা প্রয়োগ হয়। যেমন, 'যা গৌস্তিষ্ঠতি', 'যা গৌর্নিষণ্ণেতি'। উক্ত ক্ষেত্রে ঐ 'যা' শব্দের প্রয়োগ যে গো-ব্যক্তিতেই হয় তা সহজেই বোঝা যায়। কারণ গোত্ব জাতির কোন ভেদ নেই, কিন্তু গো ব্যক্তির ভেদ আছে। গো ব্যক্তির ভেদ থাকায় 'যা গৌঃ' এই প্রয়োগে 'যা' এই শব্দের দ্বারা গো নামক ব্যক্তি বিশেষকে প্রকাশ করা যায়, গোত্ব জাতি বিশেষকে নয়। ন্যায়ভাষ্যকার ব্যাৎস্যায়নও বলেছেন, 'যা' শব্দের দ্বারা ব্যক্তিতেই প্রয়োগ উপপন্ন হয়। 'ব্রাহ্মণকে গো দান করা হচ্ছে'—এই বাক্যে গো ব্যক্তিতেই দানের প্রয়োগ হওয়ায়, 'গো' শব্দের দ্বারা গো-ব্যক্তিই অর্থাৎ গো নামক দ্রব্যই অর্থ তা বোঝা যায়। কারণ গোত্ব জাতির দান সম্ভব নয়, জাতি অমূর্ত পদার্থ। একই রকম ভাবে 'পাঁচটি গরু' (সংখ্যা), 'গো বৃদ্ধি প্রাপ্ত হচ্ছে'(বৃদ্ধি) এবং 'গো ক্ষীণ হচ্ছে' (হ্রাস), আবার 'শুক্ল গো'(গুণ) প্রভৃতি শব্দ সমূহের প্রয়োগের দ্বারা গো ব্যক্তিকেই বোঝা যায়, গোত্ব জাতিকে নয়।[২০]

মহর্ষি গৌতম ব্যক্তিকে পদের বাচ্য অর্থরূপে স্বীকার করলেও সর্বদাই ব্যক্তিই যে পদের অর্থ এমন নয়। ব্যক্তিকে পদের বাচ্যার্থ বলার পাশাপাশি মহর্ষি গৌতম আকৃতিকেও পদের বাচ্যার্থরূপে গ্রহণ করেছেন। আকৃতি যে পদের বাচ্যার্থ তা উল্লেখ করতে গিয়ে মহর্ষি ন্যায়সূত্রে বলেছেন, "আকৃতিস্তদপেক্ষত্বাৎ সত্ত্বব্যবস্থানসিদ্ধেঃ"।[২১] অর্থাৎ সত্ত্ব ব্যবস্থান-সিদ্ধি আকৃতিকে অপেক্ষা করে। 'সত্ত্ব' বলতে এখানে গো, অশ্ব প্রভৃতি প্রাণীর কথাই মহর্ষি বুঝিয়েছেন। গো অশ্ব নয়, গো অশ্ব

হতে ভিন্ন ভিন্ন পদার্থ রূপেই ব্যবস্থিত। তাদের ঐ রূপে ব্যবস্থিতত্বই হল সত্ত্ব-ব্যবস্থান। আর ঐ সত্ত্ব-ব্যবস্থানের সিদ্ধি আকৃতি সাপেক্ষে। অশ্বের আকৃতি থেকে গো-র আকৃতি ভিন্ন। ফলে যে ব্যক্তি গো ও অশ্বের বিলক্ষণ আকৃতি ভেদ জানেন না, সে ব্যক্তি কিছুতেই 'এটি গোরু', 'এটি অশ্ব' এইরূপে গো এবং অশ্বের পূর্বোক্তরূপ ব্যবস্থিতত্ব বুঝতে পারে না। তাই সত্ত্ব-ব্যবস্থানের জ্ঞান বিলক্ষণ আকৃতি ভেদের জ্ঞানকে অপেক্ষা করে। 'আকৃতি' বলতে গো প্রভৃতি প্রাণীর অবয়ব এবং সেই অবয়বের যে অবয়ব তাদের বিলক্ষণ সংযোগ বিশেষকে বোঝায়। সুতরাং, গো-র অবয়ব সংযোগ আকৃতিকেই 'গৌঃ' এই পদের ব্যাচার্থ বলা উচিত।

ন্যায়সূত্রকার গৌতম পদের বাচ্যার্থ যে জাতি, অর্থাৎ গোত্ব জাতিই 'গৌঃ' পদের বাচ্যার্থ তার পক্ষে বলেছেন, মাটির তৈরি গো ব্যক্তি ও আকৃতি যুক্ত হলেও তাতে প্রোক্ষণাদির প্রয়োগ না হওয়ায়, ব্যক্তি ও আকৃতিকে পদার্থ বলা যায় না। তাই জাতিই পদার্থ। মহর্ষি আরো বলেছেন যে, যদি জাতিকে ত্যাগ করে ব্যক্তি অথবা আকৃতিকে পদার্থ বলা হয়, তাহলে মাটির দ্বারা নির্মিত গো ব্যক্তিও 'গো' পদের অর্থ হতে পারে, কারণ তাতে গোত্ব না থাকলেও গো-র আকৃতি আছে এবং তা 'গো' নামে কথিত হয়। তাছাড়া বৈধ গো-দান করার সময় কেউ মাটির গরু দান করে না। 'গো-কে প্রোক্ষণ কর', 'গো আনয়ন কর'— এই সমস্ত বাক্য মাটির গরুতে প্রযুক্ত হয় না। কারণ তাতে গোত্ব জাতি নাই। আর গোত্ব জাতি না থাকাতেই মাটির গরুতে 'গো' শব্দের মুখ্য প্রয়োগ হয় না, 'গৌঃ' এই পদের সংকেত বা শক্তি প্রযুক্ত ঐ পদের দ্বারা মাটির গরুতে যথার্থ শাব্দ বোধ হয় না, গোত্ব বিশিষ্ট গো-বিষয়েই যথার্থ শাব্দ বোধ হয়। সুতরাং গোত্ব জাতিই 'গৌঃ' এই শব্দের বাচ্যার্থ। ভাষ্যকার ব্যাৎস্যায়নও বলেছেন— 'গৌঃ' এই পদের দ্বারা যা গোত্ব জাতিবিশিষ্ট তা বোঝা যায়।[২২]

সূত্রের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে মহর্ষি বলেছেন, প্রাধান্য ও অপ্রাধান্যের অনিয়মের দ্বারা বাচ্যার্থ বিশিষ্ট হয়। ব্যক্তি, আকৃতি ও জাতিতে যে পদার্থত্ব আছে তাতে প্রাধান্য ও অপ্রধান্যের নিয়ম নাই। এই দিক থেকে কোনো স্থলে ব্যক্তি প্রধান, কোনো স্থলে আকৃতি আবার কোনো স্থলে জাতিই প্রধান হয়ে থাকে। যে সময়ে কোন একটি ব্যক্তিকে অন্য ব্যক্তি থেকে ভেদ বোঝাতে চাই অর্থাৎ যখন পদের দ্বারা ব্যক্তি বিশেষের অর্থের বোধ হয়, তখন ব্যক্তিই প্রধান, জাতি ও আকৃতি অপ্রধান। যেমন- সাদা গরু, পাঁচটি গরু ইত্যাদি। কিন্তু যে সময়ে ব্যক্তি বিশেষের ভেদ বোঝাতে না চেয়ে, ব্যক্তির সামান্যতঃ বোধ হয়, তখন জাতি প্রাধান, ব্যক্তি ও আকৃতি অপ্রধান। যেমন- গো আনয়ন কর। আবার যখন পদের দ্বারা ব্যক্তি বিশেষের আকৃতির বোধ হয়, তখন আকৃতিই প্রধান, জাতি ও ব্যক্তি অপ্রধান। যেমন- গো অশ্ব নয়। এই হল সংক্ষিপ্তাকারে মহর্ষি গৌতম কৃত "ব্যক্ত্যাকৃতি-জাতয়স্তু পদার্থঃ" সূত্রের তাৎপর্য।

প্রাচীন নৈয়ায়িকগণ স্থান-কাল ভেদে ব্যক্তি, আকৃতি ও জাতিকে বাচ্যার্থরূপে স্বীকার করলেও গঙ্গেশ উপাধ্যায়, গদাধর ভট্টাচার্য, জগদীশ তর্কালঙ্কার, বিশ্বনাথ ন্যায়পঞ্চানন প্রমুখ নব্য-নৈয়ায়িকগণ জাত্যাকৃতিবিশিষ্ট ব্যক্তিকে পদের বাচ্য অর্থরূপে স্বীকার করেছেন।[২৩] প্রাচীন ও নব্য-ন্যায় মত থেকে ভিন্ন মত পোষণ করে ব্যতিক্রম হিসেবে রঘুনাথ শিরোমণি মহাশয়ের উজ্জ্বল উপস্থিতি বিশেষভাবে নজর কারে। তিনি ব্যক্তিকেই পদের বাচ্য অর্থ বলে স্বীকার করেছেন। রঘুনাথ শিরোমণি তাঁর নিজস্ব চিন্তায় কেবলমাত্র ব্যক্তিকেই পদের বাচ্য অর্থ বলে স্বীকার করেছেন। তাঁর মতে 'গো' প্রভৃতি পদস্থলে শক্যতাবচ্ছেদক যে গোত্বাদি তার দ্বারা উপলক্ষিত গবাদিব্যক্তিমাত্রেই 'গো' প্রভৃতি পদের শক্তি স্বীকার করতে হবে। গোত্বাদি জাতি বা গো-আকৃতি 'গবাদি' পদের বাচ্য নয়।[২৪]

বৌদ্ধ দর্শন সম্মত অর্থ:

অর্থ সম্পর্কে বৌদ্ধ দারশনিকগণের স্বতন্ত্র অবস্থান লক্ষ্য করা যায়। ক্ষনিকত্ববাদি বৌদ্ধ দার্শনিকগণ অর্থক্রিয়াকারিত্ব-র উপর ভর করে অর্থকে সৎ বলে স্বীকার করেননি। বৌদ্ধ মতে অর্থ হল বুদ্ধি দ্বারা কল্পিত, বৌদ্ধার্থ। বৌদ্ধ মতে অভিধেয় সত্তা বস্তুসত্তা থেকে পৃথক হওয়ায় শব্দ কখনও বস্তুসত্তাকে গ্রহণ করতে পারে না। অভিধেয় সত্তা হল শব্দ প্রতিপাদ্য সত্তা এবং তা শুধুমাত্র বুদ্ধিতে অবস্থান করে। বুদ্ধিস্থ অর্থই যে শব্দার্থ তা প্রকাশ করতে গিয়ে ধর্মকীর্তি তাঁর প্রমাণবার্তিকে বলেছেন,

"বক্তৃব্যাপারবিষয়ো যোঽর্থো বুদ্ধৌ প্রকাশতে।

প্রামাণ্যং তত্র শব্দস্য নার্থতত্ত্বনিবন্ধনম্।।"

বক্তার বিবক্ষিত যে অর্থটি বুদ্ধিতে প্রকাশমান হয়, সেই অর্থটি কোন বাহ্য বা আন্তর বস্তুর উপর নির্ভরশীল নয়।[২৫] বৌদ্ধ মতে বুদ্ধিতে প্রকাশমান অর্থটি সামান্যলক্ষণের বিষয় বলে তা বিকল্পযুক্ত। তাঁরা মনে করেন বিষয়ের উপস্থিতি মাত্রই যে অনুভূতির উপলব্ধি হয় সেটি শুদ্ধ স্বলক্ষণের বিষয়। কিন্তু ঠিক পরমুহূর্তে ঐ বিষয়টিকে যখন শব্দসংযোগের দ্বারা নির্দেশ করা হয় অর্থাৎ 'এটি গরু', 'এটি ঘট'—এইভাবে প্রকাশ করা হয়, তখন সামান্যলক্ষণ আরোপ করা হয়। আর এই এরূপ আরোপ-কে বৌদ্ধ দার্শনিকগণ 'কল্পনা' বলেছেন। বৌদ্ধ মতে বিষয় দ্রব্য, গুণ, কর্ম, নাম ও সামান্য বা জাতি বিশিষ্ট রূপেই শব্দে প্রকাশযোগ্য হয় এবং এগুলিই হল কল্পনা। সেজন্য সকল শব্দার্থের বিষয়ই সবসময় কল্পনাযুক্ত।[২৬] তাই বৌদ্ধ দর্শনে শব্দ কখনই ক্ষণিক স্বলক্ষণকে নির্দেশ করতে পারে না। যে ক্ষণে শব্দ বস্তুকে নির্দেশ করে, সেই মুহূর্তেই তা অস্তিত্বহীন হয়, কেননা তাঁদের মতে বস্তু মাত্রেই ক্ষণিক। তাই অন্য বস্তুর ব্যাবৃত্তি বা নিষেধের

মাধ্যমে শব্দ অর্থকে নির্দেশ করে থাকে। বৌদ্ধ মতে এই নিষেধ বা ব্যাবৃত্তিকে 'অপোহ' বলা হয়। এখানে অপোহ বলতে অন্যাপোহ অর্থাৎ অন্য বস্তুর নিষেধকে বোঝানো হয়েছে। এই মতে শব্দ ও অর্থ হল অন্যাপোহ স্বরূপ।

দিঙনাগ বলেছেন যে, শব্দার্থে তাত্ত্বিকত্ব আরোপ অনভিপ্রেত, স্বলক্ষণবস্তুর প্রতিপাদন শব্দের দ্বারা হতে পারে না। কারণ তার সংকেত ও ব্যবহার সবসময় ক্ষণিক এবং তা কার্য-কারণ ও প্রতিভাস অনুযায়ী বিভিন্ন। তাই শুধুমাত্র ব্যবহারের উদ্দেশ্যে শব্দের সাংকেতিক ব্যবহার জগতে পরিদৃষ্ট হয়। এজন্য বস্তু বিষয়ে শব্দ প্রয়োগ (ব্যবহার নিমিত্ত) সর্বদা ইচ্ছা-প্রসূত ও হেতুবিবর্হিত। তাঁর মতে ব্যাবৃত্তির দ্বারা একটা শব্দ একটা অর্থকে বোঝাতে পারে এবং অর্থটি সবসময় বিকল্পযুক্ত। কোন বিষয়ে একই শব্দের পুনঃ পুনঃ প্রয়োগ দর্শন হল অবভাস। শব্দ কি অর্থে পুনঃ পুনঃ প্রযুক্ত হচ্ছে তার মূলে প্রতিভা উৎপন্ন হয়। শব্দ ব্যবহার অনন্ত এবং এই অনন্ত ব্যবহার হেতু প্রতিভার ভেদও উৎপন্ন হয়। শুধু তাই নয় উক্ত ভেদ বর্তমান থাকার ফলে তার প্রজ্ঞাপনের উদ্দেশ্যে সংকেত করণের ইচ্ছা জন্মায়।[২৭] এইরূপে কোন বিশিষ্ট কার্যে উপযোগীত্ব বোঝাবার জন্য যে শব্দ ব্যবহার করা হয় তা ইচ্ছা রচিত সংকেত ভিন্ন আর কিছু নয়। শব্দসংকেত হওয়ার পর লোকে যখন তা ব্যবহার করে তখন বস্তু দৃষ্ট হওয়া সত্ত্বেও প্রথমে হয় তার সেই পূর্ব নির্দিষ্ট সংকেতের অভোগ হয় এবং তার পর হয় সাংকেতিক নামটির স্মরণ এবং তার পরে মনে সত্তাদির প্রত্যয় জাগরিত হয়। এই প্রত্যয়ের ভিত্তি কোন বাহ্য বস্তু নয়। এর ভিত্তি অতদ্‌ব্যাবৃত্তি। অন্য পদার্থ হতে যা ব্যাবৃত্ত নয় তা কখনও শব্দের দ্বারা অভিহিত হতে পারে না। যেখানে শব্দ কোন একটি বিষয়ে প্রযুক্ত হয়, তখন সেই বিষয়ের যে অংশের সঙ্গে ঐ শব্দের অবিনাভাব সম্বন্ধ থাকে, সেই অংশটিই অন্যতরব্যবচ্ছেদ প্রক্রিয়ার মাধ্যমে শব্দের দ্বারা প্রকাশিত হয়। যথা 'শব্দঃ অনিত্যঃ কৃতকত্বাৎ' ইত্যাদি ক্ষেত্রে দেখা যায় যে, 'কৃতকত্ব' হেতু অন্যাপোহ দ্বারা অকৃতক বস্তু থেকে ব্যাবৃত্ত করে কৃতকত্বের সঙ্গে অনিত্যত্বের অধিনাভাব সম্বন্ধের ভিত্তিতে অনিত্য এই বিষয়ান্তর প্রকাশ করে। শব্দের ক্ষেত্রেও দেখা যায়, যে কোন শব্দ অন্যাপোহের দ্বারা শব্দান্তর থেকে ব্যাবৃত্ত হয়ে সেই বিষয়কেই প্রকাশ করতে পারে যে বিষয়টির সঙ্গে ঐ শব্দটির অবিনাভাব সম্বন্ধ আছে।[২৮] যাইহোক দিঙনাগের মতে শব্দ ও বিষয়ের মধ্যে অবিনাভাব সম্বন্ধ বর্তমান থাকায় শব্দ বিষয়ের প্রতিপাদক হতে পারে। লিঙ্গ বা হেতুর ক্ষেত্রে যেমন অন্বয়-ব্যতিরেক সম্বন্ধের দ্বারা অবিনাভাব সম্বন্ধ প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব, তেমনি শব্দের ক্ষেত্রেও শব্দ ও বিষয়ের মধ্যস্থিত অবিনাভাবসম্বন্ধ অন্বয়-ব্যতিরেকের দ্বারা প্রতিষ্ঠা করা যায়। অন্বয় ও ব্যতিরেক সম্পর্কে তাই শব্দ ও অর্থকে প্রতিপাদনের 'দ্বার' হিসাবে নির্দেশ করা হয়েছে।[২৯] তাই একটি শব্দ একটি নির্দিষ্ট অর্থ বোঝাতেই ব্যবহৃত হয়। আর এই ব্যবহার অতদ্‌ব্যাবৃত্তি বা অন্যাপোহ দ্বারাই হয়ে থাকে। অর্থাৎ যে কোন শব্দ অন্যাপোহের দ্বারা শব্দান্তর থেকে ব্যাবৃত্ত হয়ে সেই বিষয়কেই প্রকাশ করতে পারে যে বিষয়টির সঙ্গে ঐ শব্দটির অবিনাভাব সম্বন্ধ আছে। যেমন, সমস্ত

ক্ষেত্রেই 'ঘট' এই শব্দটি অঘটব্যাবৃত্ত একটি নির্দিষ্ট পদার্থকে বোঝাতে ব্যবহৃত হয়। একইরকমভাবে দেখা যায় যে, নীলে অনীলব্যাবৃত্তি আছে এবং তা অনীলভিন্ন। আর অনীলভিন্ন পদার্থও নীল প্রত্যক্ষের বিষয় হতে পারে। তাই নীলগত অনীলব্যাবৃত্তি নীলেরই স্বরূপ।

শান্তরক্ষিতের মতে পদের বাচ্য অর্থের কোন পারমার্থিক অস্তিত্ব নেই। শব্দার্থ হল অন্যব্যাবৃত্তি। অর্থাৎ অন্য পদার্থের ব্যাবৃত্তি হল শব্দ প্রয়োগের উদ্দেশ্য। এই ব্যাবৃত্তি হল অপোহ। তাঁর মতে, শব্দের দ্বারা যে নির্দিষ্ট অর্থ নির্দেশিত হয় তা কখনো সংবিদিত হয় না এবং শব্দের দ্বারা সংবিদিত না হওয়াই হল বস্তুর বস্তুত্ব। আপোহ-ই শব্দের বাচ্যার্থরূপে প্রকাশ পায় না বরং আপোহ জ্ঞান বিশেষ এবং যাকে জ্ঞান হতে অতিরিক্ত অর্থপ্রতিবিম্বযুক্ত বলে মনে হয়। এরূপ অর্থপ্রতিবিম্বযুক্ত জ্ঞান সবিষয়ক এবং সবিষয়ক এই অপোহাত্মক জ্ঞানের প্রতি শব্দ কারণ। আর জ্ঞানস্বরূপ অপোহে যে শব্দ জন্যতা আছে তাই হল শব্দবাচ্যতা।[৩০]

শান্তরক্ষিতের উক্ত বক্তব্যের সমর্থনের উদ্দেশ্যে কমলশীল বলেছেন যে, শব্দের বাচ্য অর্থের কোন পারমার্থিক অস্তিত্ব নাই; সর্বপ্রকার শব্দপ্রত্যয়ই হল ভ্রান্ত। অন্য পদার্থ হতে ব্যাবৃত্ত কোন বিশেষ অর্থ শব্দের দ্বারা বিহিত হয় না। অন্য পদার্থের ব্যাবৃত্তিই হল শব্দপ্রয়োগের উদ্দেশ্য। কিন্তু আমরা ভ্রান্তিবশতঃ অন্য পদার্থের ব্যাবৃত্তিতে সন্তুষ্ট না থেকে শব্দের অপর একটি বিশিষ্ট অর্থ কল্পনা করে থাকি। শব্দার্থ হল প্রকৃতপক্ষে নিষেধবাচক অপোহ। তাছাড়া শব্দের দ্বারা বাহ্য বিষয়টি নির্দেশিত হয় একথা যদি স্বীকারও করে নেওয়া হয় তাহলে ঐ শব্দের দ্বারা নির্দেশিত বাহ্য বিষয়টি শব্দের এই ভিত্তি হতে পারে না। কারণ শব্দ হতে প্রথমেই যে প্রত্যয়টি উৎপন্ন হয় সেটি কেবল শব্দ সম্বন্ধীয়, তথা শ্রাবণ প্রত্যক্ষ সম্বন্ধীয়, বস্তু সম্বন্ধীয় নয়। প্রকৃত প্রত্যয়টি হল ভ্রান্ত।[৩১]

ভারতীয় ভাষাদর্শনে অর্থ কেন্দ্রিক যে সুবিশাল ও সমৃদ্ধ আলোচনা লক্ষ্য করা যায়, তার একটি ধারাবাহিক আলোচনা ইতিপূর্বে সন্নিবেশিত হয়েছে। আমরা দেখেছি আলোচনা যত এগিয়েছে অর্থ কেন্দ্রিক বিষয়ে ভারতীয় ভাষাদার্শনিকগণের মধ্যে মত পার্থক্য ততই প্রকট হয়েছে। আমরা দেখলাম যে নৈয়ায়িকগণ পদের বাচ্য অর্থের ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে এক দিকে যেমন পদের বাস্তব সত্তা স্বীকার পাশাপাশি পদার্থেরও বাস্তব সত্তা স্বীকার করেছেন। তাঁদের মতে পদ অভিধা বা সংকেতের মাধ্যমে পদার্থকে নির্দেশ করে। আর পদের শক্তির দ্বারা যা বিষয়কৃত হয় তাই পদার্থ।

বৌদ্ধ দর্শনে বাচক শব্দ এবং বাচ্য অর্থ কোনটিই সৎ নয়। তাঁদের মতে বাচকশব্দসংসৃষ্ট জ্ঞানটি স্বলক্ষণকে বিষয় করে না। কারণ স্বলক্ষণ সত্তা অর্থক্রিয়াকারি বলে তা সর্ব প্রকার অভিলাপসংসর্গযোগের উর্দ্ধে। শব্দের দ্বারা বস্তুকে তখনই

অভিহিত করা হয় যখন সেই জ্ঞানে অন্য আকার যুক্ত হয়, যা সামান্যলক্ষণ নামে পরিচিত। বৌদ্ধ মতে বিকল্পবুদ্ধি সৎ বস্তুর উপর নানা আকার-প্রকার আরোপ করে বিশিষ্টবস্তুকে গঠন করে। এই প্রয়োগের উৎস কোন বাস্তব পদার্থ নয়।

ন্যায় মতে শব্দ হল বিধিবাচক। শব্দের দ্বারা নির্দেশিত নির্দিষ্ট আস্তিত্বশীল বস্তুকে বোঝানো হয়। ন্যায় মতে শব্দের দ্বারা নির্দেশিত বস্তুটি বাস্তবিক অস্তিত্ববান। তাদের মতে শব্দার্থ যদি বিধিবাচক না হতো অর্থাৎ শব্দের অর্থানুযায়ী কোন প্রকৃত বস্তু যদি না থাকত, তাহলে যে কোন শব্দের দ্বারা যে কোন বস্তুকে বোঝাতো। কিন্তু বাস্তবে তা হয় না। তাই ন্যায় মতে বিধিমুখে একটি পদ কখনো ব্যক্তিকে, কখনো আকৃতিকে, কখনো জাতিকে, আবার কখনো জাত্যাকৃতিবিশিষ্ট ব্যক্তিকে বোঝায়।

বৌদ্ধগণ মনে করেন শব্দ অর্থকে বিধিমুখে নির্দেশ করতে পারে না। এমনকি কোন বস্তুর সত্তা নির্দেশ করা শব্দের কার্য নয়। তাঁদের মতে অন্য পদার্থের ব্যাবৃত্তি ঘটানো হল শব্দ প্রয়োগের উদ্দেশ্য। এই ব্যাবৃত্তির অপর নাম অপোহ। যেমন, ‘গো’ পদের অর্থ হল অ-গো, অর্থাৎ যা গো নয় তা থেকে গো-এর ব্যাবৃত্তি বা অন্যাপোহ।

অর্থ কেন্দ্রিক আলোচনার একদিকে রয়েছে ন্যায় মত এবং অপর দিকে রয়েছে বৌদ্ধ মত। ন্যায় মতের সম্পূর্ণ বিপরীত মেরুতে অবস্থান করে বৌদ্ধ মত। অর্থ কেন্দ্রিক আলোচনায় উক্ত দুই দর্শন সম্প্রদায় কর্তৃক আলোচিত মতের স্বাতন্ত্র স্পষ্টভাবে ধরা পরে। ন্যায় মতে অর্থ মাত্রেই হল এমন কিছু যা বাহ্য জগতে অস্তিত্ববান, তাই তাঁদের মতে অর্থ হল বস্ত্বর্থ। এখন অর্থ যদি বাহ্য জগতে অস্তিত্ববানই হয় তাহলে প্রশ্ন থেকেই যায়, যে সমস্ত শব্দের অর্থ বাহ্য জগতে অস্তিত্ববান নয় অথচ তার লোকব্যবহারও প্রসিদ্ধ, তাহলে সেই অর্থগুলি কি? আকাশ কুসুম বা অশ্বডিম্ব ইত্যাদি শব্দগুলির অস্তিত্ব বাহ্য জগতে না থাকার জন্য নৈয়ায়িকগণ এগুলিকে অলীক বলে থাকেন। কিন্তু দৈনন্দিন লোকব্যবহারে এই শব্দগুলির ব্যবহার প্রায়শয় লক্ষ্য করা যায়। তাহলে কি কোনরকম অর্থের বোধ ব্যাতিরাকেই এই শব্দগুলি ব্যাবহৃত হয়? আবার অন্য দিকে বৌদ্ধ মতে সৎ বস্তু কখনও শব্দানুবিদ্ধ হয়ই না। তাহলে তাঁরা যে শব্দ ব্যাবহার করেন সেই শব্দ কোন্ অর্থ কে বোঝায়? প্রমাণবার্তিককারের মতে বক্তার বিবক্ষিত যে অর্থটি বুদ্ধিতে প্রকাশমান হয়, সেই অর্থটি কোন বাহ্য বা আন্তর বস্তুর উপর নির্ভরশীল নয়। তাহলে বক্তা শ্রোতার মধ্যে যোগাযোগ স্থাপন হয় কিভাবে? কোন শ্রোতা যে শব্দ প্রথম শুনছে তার বোধ কিভাবে জন্মাবে? এই ধরণের প্রশ্নগুলি প্রাসঙ্গিক বলেই মনে হয় এবং এই প্রশ্নগুলিই অর্থ কেন্দ্রিক আলোচনায় বস্ত্বর্থবাদী এবং বৌদ্ধার্থবাদী অর্থতত্ত্বের মধ্যে নিহিত বিতর্কটিকে সুনির্দিষ্টভাবে ইঙ্গিত করে। এই বিতর্ক ছিল, আছে এবং থাকবে। কালের নিরিখে এই সমস্ত দার্শনিকগণ তথা দর্শন সম্প্রদায়গুলি সম্পূর্ণভাবে ভিন্ন সময়ের। তাই

তাঁদের কে সমরেখায় দাঁড় করিয়ে একটি নির্দিষ্ট সিদ্ধান্তে পৌঁছন দুষ্কর। এই বিতর্কের নিরসন বা সমাধান সূত্র খুঁজে বেরকরা আমার এই গবেষণামূলক নিবন্ধের মূল লক্ষ্য নয়, বরং এই বিতর্ক-কে সুস্পষ্ট ও সুনির্দিষ্টভাবে তুলেধরা-ই মূল উপজীব্য। আলোচনার অন্তিম লগ্নে এসে বলতে পারি যে প্রত্যেক দার্শনিক সম্প্রদায় স্ব স্ব স্থানে নিজস্ব দৃষ্টিকোণ থেকে স্বতন্ত্র, বলিষ্ঠ ও অভ্রান্ত। ব্যবহারিক জীবনে উভয় মতেরই প্রয়োজনীয়তা আমরা উপলব্ধি করে থাকি। তাই জীবন চর্যার ক্ষেত্রে প্রয়জনের তাগিদে কখনও বস্তুর্থকে আবার কখনও বৌদ্ধার্থকে স্বীকার করতে হয়।

তথ্যসূত্র:

১। "গন্ধরসরূপস্পর্শশব্দাঃ পৃথিব্যাদিগুণাস্তদর্থাঃ"। -ন্যায়সূত্র, ১/১/১৪, গৌতম, ফণিভূষণ তর্কবাগীশ কর্তৃক অনুবাদিত, বিবৃতি, টিপ্পনীসহ (প্রথম খণ্ড),পৃষ্ঠা ২১৭।

২। "শ্রোত্রগ্রাহ্য গুণঃ শব্দঃ"। তর্কসংগ্রহ, অন্নংভট্ট, নারায়ণ চন্দ্র গোস্বামী কর্তৃক অনুবাদিত, পৃষ্ঠা ২৪৮।

৩। ন্যায়সূত্র, ২/২/১২, গৌতম, ফণিভূষণ তর্কবাগীশ কর্তৃক অনুবাদিত, বিবৃতি, টিপ্পনীসহ (দ্বিতীয় খণ্ড), পৃষ্ঠা ৩৯৩।

৪। বাৎস্যায়নভাষ্য, ২/২/১৩ সূত্রের ভাষ্য, বাৎস্যায়ন, ফণিভূষণ তর্কবাগীশ কর্তৃক অনুবাদিত, বিবৃতি, টিপ্পনীসহ (দ্বিতীয় খণ্ড), পৃষ্ঠা ৩৯৪।

৫। ন্যায়সূত্র, ১/১/৩, গৌতম, ফণিভূষণ তর্কবাগীশ কর্তৃক অনুবাদিত, বিবৃতি, টিপ্পনীসহ (প্রথম খণ্ড), পৃষ্ঠা ৮৩।

৬। ঐ, ১/১/৭, পৃষ্ঠা ১৮৯।

৭। বাৎস্যায়নভাষ্য, ১/১/৭ সূত্রের ভাষ্য, বাৎস্যায়ন, ফণিভূষণ তর্কবাগীশ কর্তৃক অনুবাদিত, বিবৃতি, টিপ্পনীসহ (প্রথমখণ্ড), পৃষ্ঠা ১৮৯।

৮। "স দ্বিবিধো দৃষ্টাদৃষ্টার্থত্বাৎ।" ন্যায়সূত্র, ১/১/৮, গৌতম, ফণিভূষণ তর্কবাগীশ কর্তৃক অনুবাদিত, বিবৃতি, টিপ্পনীসহ (প্রথমখণ্ড), পৃষ্ঠা ১৯১।

৯। বাৎস্যায়নভাষ্য, ১/১/৭ সূত্রের ভাষ্য, বাৎস্যায়ন, ফণিভূষণ তর্কবাগীশ কর্তৃক অনুবাদিত, বিবৃতি, টিপ্পনীসহ (প্রথমখণ্ড), পৃষ্ঠা ১৮৯।

১০। ন্যায়বিন্দু, ধর্মকীর্তি, সঞ্জিত কুমার সাধুখাঁ কর্তৃক বঙ্গানুবাদসহ, পৃষ্ঠা ১০৬।

১১। ন্যায়বিন্দু, ধর্মকীর্ত্তি, সত্যজ্যোতি চক্রবর্ত্তী কর্তৃক বঙ্গানুবাদসহ পৃষ্ঠা ২০।

১২। ঐ, পৃষ্ঠা ১৮- ২০।

১৩। "অর্থক্রিয়াসমর্থং যৎ পরমার্থসৎ। অন্যৎ সংবৃতিসৎ প্রোক্তং তে স্বসামান্যলক্ষ্যণে।"—প্রমাণবার্ত্তিকম্, কারিকা

২/৩, ধর্মকীর্তি, প্রমা ও প্রমাণ (ন্যায়বিন্দু ও প্রমাণবার্তিকের আলোকে), রুমা বন্দ্যোপাধ্যায়, পৃষ্ঠা ৮১ থেকে উদ্ধৃত।

১৪। "অন্যদিত্যাদি এতস্মাৎ স্বলক্ষ্যণাদ্ যদ্ অনাৎ- স্বলক্ষ্যণং যো ন ভবতি জ্ঞানবিষয়ঃ তৎ সামান্যলক্ষ্যণম্। বিকল্পজ্ঞানেনাবসীয়মানো হ্যর্থঃ সন্নিধানাসন্নিধানাভ্যাং জ্ঞানপ্রতিভাসং ন ভিনত্তি। তথা হি-আরোপ্যমাণো বহিরারোপাদস্তি। আরোপাচ্চ দূরস্থো নিকটস্থশ্চ। তথ্য সমারোপিতস্য সন্নিধানাদৎ অসন্নিধানাচ্চ জ্ঞানপ্রতিভাসস্য ন ভেদঃ স্ফুটত্বেন বা। ততঃ স্বলক্ষ্যণাদ্ অন্য উচ্চতে।"– ন্যায়বিন্দুটীকা, ধর্মোত্তর, ন্যায়বিন্দু, ধর্মকীর্তি, সঞ্জিত কুমার সাধুখাঁ কর্তৃক বঙ্গানুবাদ সহ, পৃষ্ঠা ১০৬ থেকে উদ্ধৃত।

১৫। ন্যায়বিন্দু, ধর্মকীর্ত্তি, সত্যজ্যোতি চক্রবর্ত্তী কর্তৃক বঙ্গানুবাদসহ, পৃষ্ঠা ৯।

১৬। ন্যায়সূত্র, ২/২/১৪, গৌতম, ফণিভূষণ তর্কবাগীশ কর্তৃক অনুবাদিত, বিবৃতি, টিপ্পনীসহ (দ্বিতীয় খণ্ড), পৃষ্ঠা ৩৯৩।

১৭। ন্যায়সূত্র, ১/১/৯, গৌতম, ফণিভূষণ তর্কবাগীশ কর্তৃক অনুবাদিত, বিবৃতি, টিপ্পনীসহ (প্রথম খণ্ড), পৃষ্ঠা ১৯৭।

১৮। ন্যায়সূত্র, ২/২/৬৬, গৌতম, ফণিভূষণ তর্কবাগীশ কর্তৃক অনুবাদিত ও ব্যাখ্যাসহ (দ্বিতীয় খণ্ড), পৃষ্ঠা ৫০৫।

১৯। ন্যায়সূত্র, ২/২/৬০, গৌতম, ফণিভূষণ তর্কবাগীশ কর্তৃক অনুবাদিত, বিবৃতি, টিপ্পনীসহ (দ্বিতীয় খণ্ড), পৃষ্ঠা ৪৯০।

২০। ব্যক্তিঃ পদার্থঃ, কস্মাৎ?.....দ্রব্যং ব্যক্তিরিতি হি নার্থান্তরং।"— বাৎস্যায়নভাষ্য, ২/২/৬০ সূত্রের ভাষ্য, বাৎস্যায়ন, ফণিভূষণ তর্কবাগীশ কর্তৃক অনুবাদিত, বিবৃতি, টিপ্পনীসহ (দ্বিতীয় খণ্ড), পৃষ্ঠা ৪৯১।

২১। ন্যায়সূত্র, ২/২/৬৩, গৌতম, ফণিভূষণ তর্কবাগীশ কর্তৃক অনুবাদিত, বিবৃতি, টিপ্পনীসহ (দ্বিতীয় খণ্ড), পৃষ্ঠা ৪৯৯।

২২। বাৎস্যায়নভাষ্য, বাৎস্যায়ন, ফণিভূষণ তর্কবাগীশ কর্তৃক অনুবাদিত, বিবৃতি, টিপ্পনীসহ (দ্বিতীয় খণ্ড), পৃষ্ঠা ৫০১-৫০৩।

২৩। "তস্মাৎ তৎ-তজ্-জাত্যাকৃতি-বিশিষ্ট-তৎতদ্-ব্যক্তি-বোধানুপপত্ত্যা কল্প্যমানা শক্তির্জাত্যাকৃতি-বিশিষ্ট-ব্যক্তাবেব বিশ্রাম্যতীতি।"— ভাষাপরিচ্ছেদ, সিদ্ধান্তমুক্তাবলীসহ, বিশ্বনাথ ন্যায়পঞ্চানন, পঞ্চানন শাস্ত্রী কর্তৃক অনুবাদিত, পৃষ্ঠা ৪৩৯-৪৪০।

২৪। শব্দার্থসম্বন্ধসমীক্ষা, গঙ্গাধর কর থেকে সংগৃহীত, পৃষ্ঠা ৪২৮-৪২৯।

২৫। নন্দিতা বন্দ্যোপাধ্যায়, "ভারতীয় দর্শনে শব্দার্থ ভবনা: বস্ত্বর্থ বনাম বৌদ্ধার্থ", রঘুনাথ ঘোষ ও ভাস্বতী ভট্টাচার্য চক্রবর্তী কর্তৃক সম্পাদিত 'শব্দার্থ বিচার', থেকে সংগৃহীত, পৃষ্ঠা ২৮।

২৬। "অভিলাপসংসর্গযোগ্যপ্রতিভাসপ্রতীতিঃ কল্পনা তয়া রহিতম্।"—ন্যায়বিন্দু, ধর্মকীর্তি, সত্যজ্যোতি চক্রবর্ত্তী কর্তৃক বঙ্গানুবাদসহ, পৃষ্ঠা ১১।

২৭। "অপোধারে পদশ্যাম বাক্যাদ অর্থ বিবেচতৎ।

বাক্যার্থাৎ প্রতিভাখ্যাম্ তেনাদাপ্রযুজ্যতে।"— Pramanasamuccaya V 46, Dignāga, quoted in "Apoha Theory and Pre-Dignāga Views on Sentence Meaning", K. Kunjunni Raja: Matilal, B.K and R.D. Evans (eds.) Buddhist Logic and Epistemology, page 186.

২৮। "যথৈবাকৃতকব্যুদাসেন যৎ কৃতকত্বৎ তৎ সামান্যম্ অনিত্যত্বাদিগমকম্, তথা শব্দান্তরব্যবচ্ছেদেন শব্দে সামান্যম্ উচ্যতে। তেনৈব চার্থপ্রত্যায়কঃ।"— প্রমাণসমুচ্চয়বৃত্তিটীকা, ৪৬/৩৩, দিঙনাগ: ভারতীয় দর্শনে শব্দতত্ত্ব পরিক্রমা, রঞ্জনা মুখার্জী, সর্বানী বন্দোপাধ্যায় এবং কুন্তলা ভট্টাচার্য কর্তৃক সম্পাদিত, পৃষ্ঠা ৬৮-৬৯ থেকে উদ্ধৃত।

২৯। "অন্বয়-ব্যতিরেকৌ হি শব্দস্যার্থাভিযানে দ্বারম্"। প্রমাণসমুচ্চয়বৃত্তি ৪৭, দিঙ্নাগ, ঐ।

৩০। "যস্য যস্য হি শব্দস্য যো যো বিষয় উচ্যতে।

স স সংবিদ্যতে নৈব বস্তুনাং সা হি ধর্মতা।"

—Tattvasamgraha, Karika 870, Shantaraksita, (with the commentary of kamalashila) edited by Ember Krishnamacharya, Page 275.

৩১। Tattvasamgrahapanjika, kamalashila, commentary on Karika 870 of Shantaraksita; Quoted in the Tattvasamgraha, Shantaraksita,(with the commentary of kamalashila) edited by Ember Krishnamacharya Page 275.

গ্রন্থপঞ্জি:

১। অন্নংভট্ট। *তর্কসংগ্রহ*। সম্পা. শ্রীনারায়ণচন্দ্র গোস্বামী। কলকাতা: সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার, ১৪১৩ বঙ্গাব্দ।

২। কর, গঙ্গাধর। *শব্দার্থসম্বন্ধসমীক্ষা*। কলকাতা: সংস্কৃত বুক ডিপো, ২০০৩।

৩। গৌতম। *ন্যায়সূত্র* (প্রথমখণ্ড)। সম্পা. ফণিভূষণ তর্কবাগীশ। কলকাতা: পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষৎ, ২০১১।

৪। —*ন্যায়সূত্র* (দ্বিতীয় খণ্ড)। সম্পা. ফণিভূষণ তর্কবাগীশ। কলকাতা: পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষৎ, ২০০০।

৫। —*ন্যায়সূত্র* (তৃতীয় খণ্ড)। সম্পা. ফণিভূষণ তর্কবাগীশ। কলকাতা: পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষৎ, ২০০০।

৬। ঘোষ, রঘুনাথ এবং চক্রবর্তী, ভাস্বতী (সম্পাদিত)। *শব্দার্থ বিচার*। কলকাতা: এলাইড পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, ২০০৫।

৭। দাস, করুণাসিন্ধু। *প্রাচীন ভারতের ভাষাদর্শন*। কলকাতা: প্রগ্রেসিভ পাবলিশার্স, ২০০২।

৮। ধর্মকীর্ত্তি। *ন্যায়বিন্দু*। সম্পা. সত্যজ্যোতি চক্রবর্তী। কলকাতা: সাহিত্যশ্রী, ২০১১।

৯। —*ন্যায়বিন্দু*। সম্পা. সঞ্জিত কুমার সাধুখাঁ। কলকাতা: সদেশ, ২০০৭।

১০। বন্দোপাধ্যায়, রুমা। *প্রমা ও প্রমাণ,* (ন্যায়বিন্দু ও প্রমাণবার্ষিকের আলোকে)। কলকাতা: সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার, ২০০৬।

১১। বাগচী, যোগেন্দ্রনাথ। *বাক্যার্থনিরূপণের দার্শনিক পদ্ধতি*। কলকাতা: সংস্কৃত বুক ডিপো, ১৯৮১।

১২। বিশ্বনাথ ন্যায়পঞ্চানন। *ভাষাপরিচ্ছেদ*। সম্পা. পঞ্চানন ভট্টাচার্য্য শাস্ত্রী। কলকাতা: মহাবোধি বুক এজেন্সী, ২০১৬।

১৩। —*ভাষাপরিচ্ছেদ*। সম্পা. গোপালচন্দ্র মুখোপাধ্যায়। বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৮০।

১৪। ভট্টাচার্য, অমিত। *ন্যায়বৈশেষিকের ভাষা*। কলকাতা: সংস্কৃত বুক ডিপো, ২০০৩।

১৫। ভট্টাচার্য্য, রবীন্দ্রনাথ। *শব্দতত্ত্ব*। কলকাতা: সদেশ, ২০০৮।

১৭। —*শব্দার্থতত্ত্ব*। কলকাতা: সদেশ, ২০০৯।

১৮। মণ্ডল, নীলিমা। *শাব্দবোধের বুৎপত্তিবাদপ্রসঙ্গ*। কলকাতা: শরৎ বুক ডিস্ট্রিবিউটার্স, ১৪০৯ বঙ্গাব্দ।

১৯। মুখার্জী রঞ্জনা ও বন্দোপাধ্যায় সর্বানী এবং ভট্টাচার্য কুন্তলা (সম্পাদিত)। *ভারতীয় দর্শনে শব্দতত্ত্ব পরিক্রমা*। কলকাতা: রবীন্দ্র ভারতী বিশ্ববিদ্যালয়, ২০১৪।

২০। শাস্ত্রী, পঞ্চানন। *বৌদ্ধ-দর্শনম্*। কলকাতা: গুপ্তপ্রেশ, ১৪০১ বঙ্গাব্দ।

২১। সায়ন মাধবীয়। *সর্ব্বদর্শন সংগ্রহ* (প্রথম খণ্ড)। সম্পা. সত্যজ্যোতি চক্রবর্তী। কলকাতা: সাহিত্যশ্রী, ১৪০৭।

২২। —*সর্ব্বদর্শন সংগ্রহ* (দ্বিতীয় খণ্ড)। সম্পা. সত্যজ্যোতি চক্রবর্তী। কলকাতা: সাহিত্যশ্রী, ১৪১৫।

২৩। —*সর্ব্বদর্শন সংগ্রহ*। সম্পা. উমাশঙ্কর শর্মা। বারাণসী: চৌখাম্বা বিদ্যাভবন, ২০০৪।

২৪। Chattopadhyay, Debiprasad. *Indian Philosophy: A popular Introduction*, New Delhi: Peoples Publishing House, 1972.

২৫। Matilal, B.K. and R.D. Evans.(edited). *Analytical Philosophy in comparative Perspective.* Dordrecht: D. Riedel Publishing Company, 1985.

২৬। Shantaraksita. *Tattvasamgraha*, (with the commentary of kamalashila). Edited by Ember Krishnamacharya. Baroda: Gaekward's Oriental Series: no-xxx, 1926.